পাকস্থলীতে ক্যান্সারের লক্ষণ, কী করবেন?

পাকস্থলীর রোগের মধ্যে ক্যান্সার অন্যতম। এ রোগটি প্রাথমিক অবস্থায় নির্ণয় করা গেলে বড় বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে ক্যান্সার আক্রান্ত স্থান ফেলে দিলে রোগী সুস্থ হয়ে যেতে পারে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন বৃহদন্ত্র ও পায়ুপথ সার্জারি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. একেএম ফজলুল হক।

রোগের প্রাথমিক অবস্থায় হজমক্রিয়ার গোলযোগ বা খাদ্যগ্রহণের পর পেটে অস্বস্তি অনুভুতি ছাড়া আর তেমন কোনো উপসর্গ থাকে না। এ সমস্যাগুলোকে রোগী তেমন গুরুত্ব দেন না, মনে করেন গ্যাস্ট্রিক হয়েছে।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ খেয়ে সাময়িক আরাম অনুভব করেন। ফলে ক্যান্সার পাকস্থলী থেকে শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পায়। রোগটি ছড়িয়ে পড়লে যে উপসর্গ দেখা দেয়-

* অল্প খেলে তৃপ্তি চলে আসে * পেট ফেঁপে ও ফুলে থাকে * বমি হয় * রক্তস্বল্পতা দেখা দেয় * খাদ্যগ্রহণের পর খাদ্যনালীতে ব্যথা হয় * শরীরের ওজন কমে যায় * বমির সঙ্গে রক্ত কিংবা কালো পায়খানা হতে পারে

এ সমস্যাগুলো হলে অপারেশন করালেও রোগীর আয়ুকাল খুব বেশি বাড়ানো যায় না। সাধারণত চল্লিশোর্ধ্ব বয়সে এ ক্যান্সার বেশি হয়ে থাকে। নারীদের চেয়ে পুরুষরা বেশি আক্রান্ত হন। যে কারণে পাকস্থলীতে ক্যান্সার হয়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

* হেলিকোব্যাকটর পাইলোরি নামক এক প্রকার জীবাণুর আক্রমণ

* প্রচুর পরিমাণে মদপান

* অত্যধিক লবণ আছে এমন খাবার গ্রহণ করা

* সংরক্ষিত টিনজাত খাবার

* অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের অভাব রয়েছে এমন খাবার গ্রহণ করা

* যারা ধূমপায়ী এবং ধুলাবালি স্থানে বাস করে তাদের মধ্যেও এ ক্যান্সার হতে পারে

* বংশগত কারণেও পাকস্থলীতে ক্যান্সার হয়

এক সময়ে জাপানে পাকস্থলী ক্যান্সারের কারণে অনেক লোক মারা যেত। বর্তমানে চল্লিশোর্ধ্ব বয়সের পর যাদের হজমক্রিয়ার গোলযোগ হচ্ছে তাদের এন্ডোস্কোপি করে প্রাথমিক অবস্থায় রোগ নির্ণয় করে অপারেশনের মাধ্যমে ক্যান্সারের চিকিৎসা করা হয়।

আমাদের দেশে রোগীরা যখন ডাক্তারের শরণাপন্ন হন তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্যান্সার পাকস্থলীর বাইরে ছড়িয়ে পড়ে, এরফলে চিকিৎসা করা দুরূহ হয়ে পড়ে। এ জন্য উপরের সমস্যাগুলো দেখা দেয়া মাত্রই চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত।

শরীরে ইউরিক এসিডের মাত্রা বাড়ে কেন? কী করবেন

দীর্ঘক্ষণ একই ভঙ্গিতে থাকার পর শরীরে অনেক সময় পরিবর্তন দেখা দেয়। পা ফেলতে কষ্ট হয়, জয়েন্টে ব্যথা হয়।

যখন শরীরে ইউরিক এসিডের মাত্রা বেড়ে যায় তখনই এই সমস্যা হয়। রক্তে ইউরিক এসিডের স্বাভাবিক মাত্রা পুরুষদের ক্ষেত্রে ৩.০-৭.০ মি.গ্রা./ ডি.এল এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ২.৪-৫.৭ মি.গ্রা./ডি.এল।

ইউরিক এসিড হচ্ছে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন এবং কার্বনের হেটারোসাইক্লিক যৌগিক পদার্থ। এটি মানবদেহের অ্যান্ড কম্পাউন্ড, যা কিডনি দ্বারা ফিল্টারেট হয়ে প্রস্রাবের সঙ্গে শরীর থেকে বেড়িয়ে যায়। যদি কোনো কারণে এই ইউরিক এসিড তৈরির প্রক্রিয়ায় গোলমাল হয় বা কিডনি দ্বারা কম বের হয় তখন রক্তে এর মাত্রা বেড়ে যায়।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন আল রাজি হাসপাতালের কনসালটেন্ট (পথ্য ও পুষ্টি) তামান্না রুবিন।

বেশকিছু কারণে শরীরে ইউরিক এসিডের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে ডাইইউরেটিক, এ্যালকোহল, অবিসিটি বা ওজনাধিক্য, কিডনির সমস্যা, হাইপোথাইরয়েডিজম, সোরিয়াসিস বা পাঁচড়া জাতীয় চর্মরোগ, জেনেটিকস, টিউমার, লাইসিস সিন্ড্রোম, ইমিউন সাপ্রেসিং ড্রাগস, নায়াসিন বা ভিটামিন বি-৩, অতিরিক্ত পিউরিন সমৃদ্ধ খাবার ইত্যাদি।

রক্তের ইউরিক এসিডের ৩ ভাগের ২ ভাগ আসে দেহের পিউরিন নামক পদার্থ ভেঙ্গে এবং ১ ভাগ আসে খাবার থেকে। খাবারে থাকা পিউরিন এবং প্রোটিন ডিগ্রেডেশন শরীরে ইউরিক এসিডের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

দুই-তৃতীয়াংশ মানুষের ক্ষেত্রে এই বাড়তি ইউরিক এসিড শরীরের কোনো ক্ষতি করে না। কারো কারো ক্ষেত্রে রক্তে ইউরিক এসিড অতিমাত্রায় বেড়ে গেলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে হাইপার ইউরেসিমিয়া বলে।

তখন বাড়তি ইউরিক এসিড জয়েন্ট বা গিড়ায় ক্রিস্টাল সৃষ্টি করে, গিড়ায় তীব্র ব্যথা অনুভূত হয় এবং লাল হয়ে ফুলে যায়, জ্বালাপোড়া করে। এই অবস্থাকে গাউট বা গেঁটে বাত বলে। শুরুতে গাউটে একটিমাত্র গিরা বিশেষ করে পায়ের বুড়ো আঙ্গুল আক্রান্ত হয়। এ ছাড়াও ইউরিক এসিডের কারণে আর্থ্রাইটিস, জুভেনাইল আর্থ্রাইটিস, মেটাবলিক এসিডোসিস, কিডনি স্টোনও হতে পারে।

চিকিৎসকের কাছে গিয়ে টেস্ট করিয়ে প্রয়োজনীয় ওষুধ সেবন করা যেমন জরুরি ঠিক তেমনি একজন পুষ্টিবিদের পরামর্শ গ্রহণও গুরুত্বপূর্ণ। রক্তে ইউরিক এসিডের মাত্রা বেড়ে গেলে তা নিয়ন্ত্রণে ওষুধের চেয়ে বেশি কার্যকর হচ্ছে সঠিক ডায়েট। ডায়েটের মাধ্যমে খুব সহজেই রক্তের ইউরিক এসিডের মাত্রা কমিয়ে ফেলা যায়। কারণ, খাবারে পিউরিনের মাত্রা বা পিউরিনসমৃদ্ধ খাবার বেশি খেলে ইউরিক এসিডের মাত্রা অনেক গুণ বেড়ে যায়। ইউরিক এসিডের মাত্রা স্বাভাবিক করতে কিছু খাদ্য খাদ্য তালিকা থেকে বর্জন করা উচিত।

যে খাবারে ইউরিক এসিড বেশি থাকে

* সামুদ্রিক মাছ, গরু ও খাসির মাংস, হাঁস বা ভেড়ার মাংস, কলিজা, মগজ, ফুসফুস, গুর্দা, মাশরুম, মুরগির চামড়া, চিংড়ি, কাঁকড়া,

শুঁটকি, ইলিশ মাছ, মাংসের স্যুপ, পায়া, মাছের কাঁটা, মাছের ডিম।

* মসুর ডাল, মাষকলাই ডাল, মটর, চিনাবাদাম, কাঠবাদাম, তিল, সিমের বীচি।

* পুঁই শাক, পালং শাক, মুলা শাক, পাট শাক।

* মুলা, ঢ়েঁড়স, মিষ্টি কুমড়া, বীচি জাতীয় খাবার, মিষ্টি আলু, ওলকপি, বিট, টমেটো, বাঁধাকপি, ফুলকপি, সজনে, সিম, বরবটি, কাঁঠালের বীচি, সিমের বীচি, বেগুন।

* সব ডাল, বাদাম ও বাদাম জাতীয় খাদ্য, লবণ যুক্ত খাদ্য, অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত ও তেলে ভাজা খাবার, হাঁসের ডিম, কফি, আচার, ইস্ট বা ইস্টের তৈরি যে কোনো খাবার, পনির।

যে খাবার গ্রহণ করা যেতে পারে

* প্রোটিন- যেহেতু এ সব রোগীদের ক্ষেত্রে প্রোটিন জাতীয় খাবার বর্জন করার পরামর্শ দেয়া হয় তাই সারা দিনের প্রোটিনের চাহিদা মেটাতে মিঠা পানির মাছ ও চামড়া ছাড়া মুরগী, ডিমের সাদা অংশ, টক দই, দুধ গ্রহণ করা যেতে পারে।

* শাক- লাল শাক, ডাটা শাক, সরিষা শাক, লাউ শাক।

* সবজি- কাঁকরোল, পেঁপে, ধুন্দল, চিচিঙ্গা, পটল, করলা (অবশ্যই বীচি ছাড়া)।

* ফল- সবুজ আপেল, নাশপাতি, পাকা পেঁপে, বীচি ছাড়া পেয়ারা, বীচি ছাড়া পাকা বেল।

* অন্যান্য- চাল, আটা, ময়দা, সুজি, ভুট্টা, সেমাই, চিড়া, মুড়ি, কর্নফ্লেক্স, সাবুদানা, মুগ ডাল (অল্প পরিমাণে)।

* পানি- অবশ্যই পর্যাপ্ত পানি পান করতে ভুলবেন না। পানি আপনার শরীরের ইউরিক এসিডকে ইউরিনের মাধ্যমে শরীর থেকে বের করে ফেলে রক্তে ইউরিক এসিডের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করবে।

সঠিক ডায়েটের পাশাপাশি ‘থেরাপিউটিক ফুড’ ইউরিক এসিডকে কমিয়ে দিতে ভালো কাজ করে

* ১ গ্লাস লাউয়ের জুস, ১ চামচ মৌরির গুঁড়া, ২/৩টি গোল মরিচের

গুঁড়া ভালোভাবে মিক্স করে সকালবেলার নাশতার সময় খেতে পারেন। উপকারিতা- এতে ভিটামিন ‘বি’ ও ‘সি’ আছে, যা ডিটক্সিফিকেশন হিসেবে কাজ করে বডির ইউরিক এসিডকে কমিয়ে দেয়।

* ২০০ মিলি পানির সঙ্গে ২ চা চামচ মেথি রাতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। সকালে পানি ছেঁকে নিয়ে মেথিগুলো পেস্ট বানিয়ে সেই ২০০ মিলি পানির সঙ্গে জ্বাল করে ফুটাতে হবে। এই পানীয় সকালের নাশতা খাবার ১০-১৫ মিনিট আগে খেতে হবে। উপকারিতা- আয়রন খুব বেশি থাকে এবং ব্যথা দূর করে।

* ১ চামচ মধুর সঙ্গে ১ চামচ কালো জিরার তেল মিক্সড করে ১০-১৫ দিন খেতে পারেন। উপকারিতা- ব্যথা দূর করতে বেশ কার্যকারী।

* দৈনিক কাঁচা রসুন খেতে পারেন ৫/৬টি কোয়া। উপকারিতা- ব্যথা দূর করতে কার্যকারী।

সঠিক ডায়েটের মাধ্যমে ইউরিক এসিডের মাত্রা কমে গেলে ২ মাস পর আবার রক্তের ইউরিক এসিডের মাত্রা পরীক্ষা করুন। ইউরিক এসিডের মাত্রা স্বাভাবিক হলেও সহসাই আবার বাদকৃত খাবারগুলাকে খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না, ধীরে ধীরে বিশেষজ্ঞের পরামর্শে স্বাভাবিক খাদ্য তালিকায় ফিরে যেতে হবে। রক্তে ইউরিক এসিড বেড়ে গেলে অবশ্যই সঠিক ডায়েট ঠিক করে ফেলুন যা খুব সহজেই ব্যথামুক্ত এবং অতিশিগগির সুস্থ করে তুলতে সাহায্য করবে।

আঘাত থেকে মানসিক বিপর্যয়, কী করবেন

প্রচন্ড আঘাত থেকে অনেক সময় মানসিক বিপর্যয় ঘটে। এ অবস্থা থেকেও মানুষ ফিরে আসে। তবে সঠিক চিকিৎসা ও সেবা দরকার হয়।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতারের সহকারী অধ্যাপক (সাইকিয়াট্রি) ডা. সাইফুন্ নাহার।

তীব্র মানসিক চাপ তৈরি করার মতো ঘটনা যেমন; বন্যা, ভূমিকম্প,

* [illegible]

* [illegible] (avoidance of reminders) [illegible] [illegible] (numbness)

* [illegible]

* [illegible]

* [illegible]

* অপরাধবোধে ভোগা বা নিজেকে দোষী ভাবা, লাঞ্ছিত বোধ করা

* একা বা বিচ্ছিন্নবোধ করা

* বিশ্বাস হারিয়ে ফেলা, প্রতারিত বোধ করা

* মনোযোগে সমস্যা, স্মরণশক্তি কমে যাওয়া

* হতাশা, নৈরাশ্য দেখা দেয়া

শিশুদের লক্ষণগুলো প্রাপ্তবয়স্কদের চেয়ে ভিন্ন হতে পারে। যেমন-

* পিতামাতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ভয়

* আগের শেখা কাজগুলো ভুলে যাওয়া (যেমন : টয়লেট ট্রেইনিং)

* ঘুমের সমস্যা, দুঃস্বপ্ন দেখা

* দুর্ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয় এমন নতুন কিছুর প্রতি ভয় তৈরি হওয়া (রাক্ষসের ভয়)

* খেলা, ছবি আঁকা বা গল্প বলার মধ্য দিয়ে দুর্ঘটনার বিষয় প্রকাশ করা

* কোনো কারণ ছাড়াই শরীরের বিভিন্ন স্থানে ব্যথা, বেদনা অনুভব করা

* খিটখিটে মেজাজ, আগ্রাসী আচরণ করা

চিকিৎসা

মানসিক চাপের লক্ষণ, কারণ, সময়কাল, তীব্রতা ও অতীতে মানসিক আঘাত পাওয়ার ইতিহাস, বংশগত ইতিহাস, পূর্বে মানসিক রোগের ইতিহাস, শারীরিক রোগের ইতিহাস, মানসিক এবং শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিশদ মূল্যায়নের মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করা হয়। তারপর, আক্রান্ত ব্যক্তির বিশেষ প্রয়োজনকে গুরুত্ব দিয়ে চিকিৎসা পরিকল্পনা করা হয়। চিকিৎসার মূল লক্ষ্য হচ্ছে-

* লক্ষণগুলো কমানো

* সমস্যাগুলো মোকাবেলায় দক্ষ হতে প্রশিক্ষণ প্রদান

* আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনা

* সাইকোথেরাপি অথবা ওষুধ অথবা উভয়ের সমন্বয়ে মূল চিকিৎসা করা হয়। যেহেতু মানসিক আঘাতের কারণ, ব্যক্তিবিশেষের অভিজ্ঞতা এবং পরিণতি ভিন্ন হয় সেহেতু রোগের লক্ষণ এবং রোগীর প্রয়োজনের ওপর নির্ভর করে চিকিৎসাপদ্ধতিও কিছুটা ভিন্ন হতে পারে

* সাইকোথেরাপির মাঝে ট্রমা ফোকাসড কগনিটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি (কগনিটিভ প্রসেসিং থেরাপি, প্রোলং এক্সপোজার থেরাপি), ইএমডিআর (আই মুভমেন্ট ডিসেনসিটাইজেশন অ্যান্ড রিপ্রসেসিং) বেশ কার্যকর

* কগনিটিভ প্রসেসিং থেরাপি- এর মাধ্যমে দুর্ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নিজের এবং অন্যদের সম্পর্কে রোগীর নেতিবাচক চিন্তা- যেগুলো তার আচরণকে প্রভাবিত করছে এবং দৈনন্দিন জীবনকে ব্যাহত করছে সেগুলোকে শনাক্তকরণ ও সংশোধন করা হয়। এটি প্রতি সপ্তাহে ৬০-৯০ মিনিট করে মোট ১২ সপ্তাহ ধরে দিতে হয়।

* প্রোলং এক্সপোজার থেরাপি- রোগীর সঙ্গে কথা বলে তার মানসিক আঘাত সম্পর্কে বিস্তারিত জানা হয় এবং তার ভয়ের উৎস খুঁজে বের করা হয়। তারপর তাকে ধাপে ধাপে ভয়ের উৎসগুলোকে মোকাবেলা করে ভয়কে জয় করতে শেখানো হয়।

এছাড়া প্রগ্রেসিভ মাসকিউলার রিলাক্সেশন, ব্রিদিং রিলাক্সেশন ইত্যাদি ব্যায়াম খুব কার্যকর।

ওষুধের মাঝে সিলেকটিভ সেরোটোনিন রিআপটেক ইনিহবিটর্স (SSRI), পিটিএসডি এর চিকিৎসায় কার্যকর। এর মাঝে সারট্রালিন এবং পেরোক্সেটিন এফডিএ (FDA-U.S) অনুমোদিত। এগুলো পিটিএসডি রোগীর বিষণ্ণতা, উদ্বেগ, রাগ ইত্যাদি কমাতে সাহায্য করে। তাছাড়া রোগীর নিদ্রাহীনতা, অস্থিরতা, সন্দেহপ্রবণতা ইত্যাদি কমাতে কিছু এন্টিসাইকোটিক (যেমন ওল্যানযেপাইন, কিউটিয়াপাইন, রিসপেরিডোন) ইত্যাদি কার্যকর। ঘুমের সমস্যা দূর করতে এবং রোগীকে প্রশান্ত করতে বেন্জোডায়াজেপাইন ব্যবহার করা যায় তবে সেগুলোতে নির্ভরশীল হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

সাইকোথেরাপি শুরু করার আগে অথবা চলাকালীন সময়ে ওষুধ গ্রহণ করলে চিকিৎসা বেশি কার্যকর হয়।

রোগী/দুর্ঘটনায় বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিকে সংকটাবস্থা থেকে নিরাপদ

অবস্থায় আনার পর পিটিএসডি-এর সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা শুরু করা উচিত। মাদকাসক্তি, বিষণ্ণতা, আত্মহত্যার প্রবণতা, প্যানিক ডিসঅর্ডার ইত্যাদি থাকলে গুরুত্ব দিয়ে সেগুলোর চিকিৎসা করতে হবে।

চিকিৎসা প্রদানের সময় যে বিষয়ে সতর্ক হতে হবে সেগুলো হল-

* রোগীর কষ্টকর অভিজ্ঞতার কথা জানাতে অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ করা যাবে না

* রোগীর প্রতি সহমর্মী হতে হবে, তাদের অনুভূতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে

* সর্ব প্রকার গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে

* এমন কোনো কথা বলা বা কাজ করা যাবে না যাতে রোগী আবার আঘাত (retraumatized) পায়।

যেসব কারণে পেপটিক আলসার হয়, চিকিৎসা

প্রত্যেকটি মানুষেরই গ্যাস্ট্রিক সমস্যা রয়েছে। কারো কারো আলসারও হয়। সাধারণ লোকজন গ্যাস্ট্রিক বা আলসার বলতে যা বুঝিয়ে থাকেন চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় একে পেপটিক আলসার বলা হয়।

পেপটিক আলসার হওয়ার কারণ নিয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন বৃহদান্ত্র ও পায়ুপথ সার্জারি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. একেএম ফজলুল হক।

* বংশগত : নিকটতম আত্মীয়-স্বজন এ রোগে ভুগে থাকলে তাদের পেপটিক আলসার হবার ঝুঁকি বেশি থাকে। রক্তের গ্রুপ ‘ও’ তাদের মধ্যে এ রোগের প্রবণতা বেশি।

* রোগ-জীবাণু: হেলিকোবেক্টার পাইলোরি নামক এক প্রকার অনুজীব এ রোগের জন্য বহুলাংশে দায়ী।

* ওষুধ: ব্যথানাশক ও স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ বিশেষভাবে

উল্লেখযোগ্য।

* ধূমপান : ধূমপায়ীদের মধ্যে এ রোগের প্রবণতা বেশি।

সাধারণত যে কথাটা প্রচলিত ভাজা-পোড়া কিংবা ঝাল জাতীয় খাবার খেলে পেপটিক আলসার হয় এর কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ চিকিৎসা বিজ্ঞানে মেলেনি। যারা নিয়মিত আহার গ্রহণ করেন না কিংবা দীর্ঘ সময় উপোস থাকেন তাদের মধ্যে পেপটিক আলসার দেখা দিতে পারে।

চিকিৎসা

শৃঙ্খলা: পেপটিক আলসারে আক্রান্ত রোগীদের অবশ্যই ধূমপান বন্ধ করতে হবে। ব্যথানাশক ওষুধ ও এসপিরিন জাতীয় ওষুধ সেবন থেকে যথা সম্ভব বিরত থাকতে হবে এবং নিয়মিত খাবার গ্রহণ করতে হবে।

ঔষধ: পেপটিক আলসারের রোগীরা সাধারণত এন্টাসিড, রেনিটিডিন, ফেমোটিডিন, ওমিপ্রাজল, লেনসো প্রাজল, পেনটো প্রাজল জাতীয় ওষুধ সেবনে উপকৃত হন।

কারণভিত্তিক চিকিৎসা: জীবাণু জনিত কারণে যদি এ রোগ হয়ে থাকে তবে বিভিন্ন ওষুধের সমন্বয়ে চিকিৎসা দেয়া হয়।

পাকস্থলীর ক্যান্সার কেন হয়

পাকস্থলীর ক্যান্সার সবচেয়ে জটিল রোগগুলোর মধ্যে একটি। সঠিক সময়ে চিকিৎসা না নিতে পারলে বড় ধরনের স্বাস্থ্যঝুঁকি দেখা দিতে পারে। অনেক সময় মৃত্যুও হতে পারে।

এ রোগটি প্রাথমিক অবস্থায় নির্ণয় করা গেলে এবং অপারেশনের মাধ্যমে ক্যান্সার আক্রান্ত স্থান ফেলে দিলে রোগী সুস্থ হয়ে যেতে পারে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন বৃহদন্ত্র ও পায়ুপথ সার্জারি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. একেএম ফজলুল হক।

রোগের প্রাথমিক অবস্থায় হজমক্রিয়ার গোলযোগ বা খাদ্যগ্রহণের পর

পেটে অস্বস্তি অনুভুতি ছাড়া আর তেমন কোনো উপসর্গ থাকে না। এ সমস্যাগুলোকে রোগী তেমন গুরুত্ব দেন না, মনে করেন গ্যাস্ট্রিক হয়েছে।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ খেয়ে সাময়িক আরাম অনুভব করেন। ফলে ক্যান্সার পাকস্থলী থেকে শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পায়। রোগটি ছড়িয়ে পড়লে যে উপসর্গ দেখা দেয়-

* অল্প খেলে তৃপ্তি চলে আসে * পেট ফেঁপে ও ফুলে থাকে * বমি হয় * রক্তস্বল্পতা দেখা দেয় * খাদ্যগ্রহণের পর খাদ্যনালীতে ব্যথা হয় * শরীরের ওজন কমে যায় * বমির সঙ্গে রক্ত কিংবা কালো পায়খানা হতে পারে

এ সমস্যাগুলো হলে অপারেশন করালেও রোগীর আয়ুকাল খুব বেশি বাড়ানো যায় না। সাধারণত চল্লিশোর্ধ্ব বয়সে এ ক্যান্সার বেশি হয়ে থাকে। নারীদের চেয়ে পুরুষরা বেশি আক্রান্ত হন। যে কারণে পাকস্থলীতে ক্যান্সার হয়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

* হেলিকোব্যাকটর পাইলোরি নামক এক প্রকার জীবাণুর আক্রমণ

* প্রচুর পরিমাণে মদপান

* অত্যধিক লবণ আছে এমন খাবার গ্রহণ করা

* সংরক্ষিত টিনজাত খাবার

* অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের অভাব রয়েছে এমন খাবার গ্রহণ করা

* যারা ধূমপায়ী এবং ধুলাবালি স্থানে বাস করে তাদের মধ্যেও এ ক্যান্সার হতে পারে

* বংশগত কারণেও পাকস্থলীতে ক্যান্সার হয়

এক সময়ে জাপানে পাকস্থলী ক্যান্সারের কারণে অনেক লোক মারা যেত। বর্তমানে চল্লিশোর্ধ্ব বয়সের পর যাদের হজমক্রিয়ার গোলযোগ হচ্ছে তাদের এন্ডোস্কোপি করে প্রাথমিক অবস্থায় রোগ নির্ণয় করে অপারেশনের মাধ্যমে ক্যান্সারের চিকিৎসা করা হয়।

আমাদের দেশে রোগীরা যখন ডাক্তারের শরণাপন্ন হন তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্যান্সার পাকস্থলীর বাইরে ছড়িয়ে পড়ে, এরফলে চিকিৎসা করা দুরূহ হয়ে পড়ে। এ জন্য উপরের সমস্যাগুলো দেখা দেয়া মাত্রই

ডায়াবেটিস রোগীরা কি কাঁঠাল খাবেন

ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীরা খাবারে বিধিনিষেধ ও মিষ্টি স্বাদের আধিক্যের কারণে কাঁঠাল খেতে দ্বিধা করেন। গ্রীষ্মের রসালো ফল কাঁঠালের আছে অনেক পুষ্টিগুণ। কিন্তু ডায়াবেটিস রোগীদের কি কাঁঠাল খাওয়া ঠিক কিংবা তারা কাঁঠাল খেলে কতটুকু খাবেন, চলুন জেনে নেওয়া যাক।

কোনো খাবারে দেহে শর্করার মাত্রা কতটা বৃদ্ধি পায়, পুষ্টিবিদরা তা মাপেন মূলত গ্লাইসেমিক ইনডেক্সের মাধ্যমে। চিকিৎসাবিজ্ঞান সংশিষ্ট বিশেষজ্ঞরা বলছেন, একশোর মধ্যে কাঁঠালের গ্লাইসেমিক ইনডেক্সের মান প্রায় ৫০ থেকে ৬০। অর্থাৎ কাঁঠালের লাইসেমিক ইনডেক্স মাঝারি।

যদি কোনো ডায়াবেটিসের রোগী দিনে পাকা কাঁঠালের তিন–চারটি কোষ খান তাহলে ওই দিন অন্য কোনো মিষ্টি ফল খেতে পারবেন না

কাঁঠালে থাকে প্রচুর পরিমাণ ফাইবার, যা পাচন প্রক্রিয়ার গতি কমিয়ে দেয় ফলে আচমকা রক্তের শর্করার মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় আশঙ্কা কমে। সব মিলিয়ে ডায়াবেটিস রোগীরা অল্প পরিমাণে কাঁঠাল খেতে পারেন। যদি কোনো ডায়াবেটিসের রোগী দিনে পাকা কাঁঠালের তিন থেকে চারটি কোষ খান তাহলে ওই দিন অন্য কোনো মিষ্টি ফল খেতে পারবেন না। তবে সবার রোগের তীব্রতা সমান নয়, তাই কাঁঠাল যদি খেতেই হয়, তবে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে খাওয়াই বাঞ্ছনীয়।

পাশাপাশি যাদের অ্যালার্জির সমস্যা রয়েছে, তাদের এই ফল এড়িয়ে চলাই ভালো। বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে কাঁঠালের প্রতিক্রিয়ায় রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়ার সমস্যা দেখা দিতে পারে। কিডনির সমস্যা থাকলেও খাওয়া চলবে না কাঁঠাল। কারণ, কাঁঠাল রক্তে পটাশিয়ামের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে।

দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকলে কি ওজন কমে

স্থূলতা একটি রোগ। শরীরে বাড়তি মেদ জমে নানাবিধ রোগের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গেছে, দেহের এই ওজন বৃদ্ধির সঙ্গে নানাবিধ অসুখ-বিসুখের একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

টাইপ-২ ডায়াবেটিস, গল ব্লাডারের ডিজিজ, হাইপারটেনশন, ডিসলিপিডেমিয়া, ইনসুলিন রেজিসটেন্স, এথেরোস্কে¬রোসিস, করোনারি হার্ট ডিজিজ, মেটাবলিক সিনড্রোম, স্ট্রোক, গাউট (গেঁটেবাত), অস্টিও আর্থ্রাইটিস, ক্যান্সার, রিপ্রোডাকটিভ অ্যাব নরমালিটিস, স্লিপ এপনিয়া, হার্নিয়া, অ্যাজমা, স্কিন কমপ্লিকেশনসহ আরও নানাবিধ রোগের অন্যতম কারণ দেহের অতিরিক্ত ওজন বৃদ্ধি।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন আল-রাজী হাসপাতালের কনসালটেন্ট পুষ্টিবিদ তামান্না রুবিন।

স্থূলতা নির্ণয়ের একাধিক পদ্ধতি রয়েছে। কাম্য ওজন অপেক্ষা শতকরা ১০ ভাগ বেশি হলে সামান্য মোটা কিন্তু, ওজন যদি শতকরা ২০ ভাগের বেশি হয় তবে তাকে রীতিমতো মোটা বা স্থূল বলে গণ্য করতে হবে।

দীর্ঘক্ষণ না খেয়ে থাকলে আপনার শরীরের মেটাবলিক রেট অনেক স্লো হয়ে যাবে, আর এক্ষেত্রে পরে আপনি যে খাবারটিই খাবেন তা আপনার শরীরে ধরে রাখবে, সুতরাং দীর্ঘসময় না খেয়ে থাকাও ওজন বাড়ার একটি অন্যতম কারণ।

এছাড়া ওজন নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আপনি যদি না খেয়ে থাকেন কিংবা সুষম খাদ্য তালিকা বা ব্যালান্সড ডায়েট মেনে না চলেন, ওজন সাময়িক সময়ের জন্য কিছুটা কমলেও পরে আপনার ওজন আরও দ্বিগুণ মাত্রায় বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে, সেই সঙ্গে আপনার বিভিন্ন কমপ্লিকেশনস দেখা দেবে যেমন- বিভিন্ন ভিটামিন এবং মিনারেলসের অভাবজনিত রোগ, চুল ঝরে যাওয়া, হতাশা, দুর্বলতা, রক্তের হিমোগ্লোবিন কমে যাওয়া, বয়সের ছাপ, চামড়া রুক্ষ হওয়া, নখ ভেঙে যাওয়া, অতি মাত্রায় এসিডিটি ইত্যাদি। সুতরাং ওজন কমাতে হবে খেয়ে, না খেয়ে নয়।

সারাদিনের খাদ্য তালিকাটিতে অবশ্যই কার্বহাইড্রেট, প্রোটিন, ভিটামিনস এবং মিনারেলস থাকতে হবে।

কোন খাবার কতটুকু খাবেন

প্রথমত: ক্যালরি নির্ধারণ করা। ক্যালরিনির্ভর করবে প্রত্যেক ব্যক্তির তার নিজস্ব ওজন, উচ্চতা, বয়স, দৈহিক শ্রমের পরিমাণ এবং শারীরিক অবস্থা ইত্যাদির ওপর। সুতরাং সঠিক ক্যালরি নিরূপণ করে সেই খাদ্য তালিকায় খাদ্যের প্রত্যেকটি বিভাগ থেকে খাদ্য নির্বাচন করতে হবে যেমন- কার্বহাইড্রেট, প্রোটিন, বিভিন্ন ভিটামিন এবং মিনারেলস জাতীয় খাবার।

দ্বিতীয়ত: সারাদিনের খাদ্য তালিকাটিকে ৬ বেলায় ভাগ করে নিতে হবে। এক্ষেত্রে কার্বহাইড্রেট থেকে ৬-৭ সার্ভিং, প্রোটিন জাতীয় খাদ্য থেকে ২ সার্ভিং, সবজি থেকে ৫ সার্ভিং, ফল থেকে ২ সার্ভিং, দুধ ও দুধজাতীয় খাদ্য থেকে ১ সার্ভিং, রান্নার তেল-৩ চা চামচ (মনো আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি এসিড), বাদাম ১.৫ আউন্স।

ওজন নিয়ন্ত্রণে সকালবেলা পরোটা/ভাতের পরিবর্তে লাল আটার রুটি/ওট নেয়া যেতে পারে। ডিম পোচ বা ওমলেট এর পরিবর্তে ডিম সিদ্ধ হতে পারে এবং মিক্সড সবজি (রঙ্গিন সবজি ৩/৪ রকমের) রাখা যেতে পারে। রান্নায় তেলের ব্যবহার কমাতে হবে, এক্ষেত্রে রান্নার সময় মাছটাকে না ভেজে রান্না করা যেতে পারে। ওজন নিয়ন্ত্রণে তেলের ইনটেক কমাতে হবে, ১ চামচ তেলে ৪৫ ক্যালরি থাকে। মধ্য সকাল বেলায় মিক্সড নাট, চিকেন স্যুপ দই হতে পারে।

বিকালে শসার সালাদ, ছোলা, ফলের জুস (টক ফল) হতে পারে। রাতের বেলায় শারীরিক শ্রম কম থাকে বলে ক্যালরি বার্ন কম হয় তাই সকাল ও দুপুরের তুলনায় কিছুটা পরিমাণে কম খেতে হবে। সেসঙ্গে অবশ্যই নির্দিষ্ট সময় কমপক্ষে ১ ঘণ্টা ব্যায়াম করতে হবে।

মোট কথা, ওজন একটু বৃদ্ধি পেলেই ঘনীভূত ক্যালরিবহুল খাদ্যগুলো বাদ দিয়ে বয়স-ওজন-উচ্চতা অনুসারে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ও সঠিক পদ্ধতিতে খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করে তা মেনে চলুন। আর তাই ওজন কমাতে বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হন।

আপনার দেহের ওজন যেমন রাতারাতি বৃদ্ধি পায়নি সুতরাং তা নিয়ন্ত্রণে কিছুটা সময় দিন, নিজের এবং বিশেষজ্ঞের প্রতি ভরসা রাখুন। ধৈর্যের সঙ্গে পরিবর্তিত খাদ্য তালিকাটি উপভোগ করুন। মনে

রাখবেন, ওজন নিয়ন্ত্রণ সময়সাপেক্ষ কিন্তু অসম্ভব নয়।

যেসব লক্ষণে বুঝবেন শিশুর কৃমি, কী করবেন

শিশুরা প্রায় সময়ই পেট ব্যথার কথা বলে থাকে। অনেক সময় চুলকানির কথাও বলে থাকে। কৃমির সমস্যার কারণে এমন হয়ে থাকে।

শিশুর কৃমির লক্ষণ ও করণীয় নিয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের শিশু স্বাস্থ্য বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডা. প্রণব কুমার চৌধুরী।

খাদ্যে অরুচি, পেট ব্যথা, পাতলা পায়খানা, বমি বমি ভাব, পায়খানার রাস্তায় চুলকানি ইত্যাদি সমস্যাগুলো প্রায়ই শিশুদের মাঝে দেখা যায়। এগুলো কৃমির লক্ষণ।

সংক্রমণের কারণ: অস্বাস্থ্যকর টয়লেট ব্যবস্থা, অপরিষ্কার ঘরবাড়ি, দূষিত পানির ব্যবহার, টয়লেট শেষে ভালোভাবে হাত না ধোয়া, খাবার তৈরি বা গ্রহণের আগে হাত পরিষ্কার না করা, হাতের নখ বড় রাখা, দাঁত দিয়ে নখ কাটা ইত্যাদি।

কৃমির প্রকারভেদ ও স্বাস্থ্য সমস্যা: বিভিন্ন প্রকার কৃমির মধ্যে গোলকৃমি, ফিতা কৃমি ও গুঁড়া কৃমির প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা যায়। কখনও কখনও গোলকৃমি শিশুর নাক-মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে।

এটি শিশুর শ্বাসনালিতেও প্রবেশ করতে পারে। এ ছাড়া এটি শিশুর অন্ত্রে বা পিত্তনালিতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারে। ফিতা কৃমি শিশুর অন্ত্রে লেগে থেকে রক্তপাত ঘটায়। এতে শিশু ধীরে ধীরে রক্তশূন্য হয়ে পড়ে। পায়খানার রাস্তায় চুলকানির জন্য গুঁড়া কৃমি দায়ী।

কৃমি ও অপুষ্টি : কৃমির কারণে শিশু অপুষ্টিতে আক্রান্ত হয়। কৃমি অন্ত্রে রক্তপাত ঘটিয়ে একদিকে শিশুকে রক্তশূন্য করে আবার অন্ত্রে পুষ্টি উপাদানের পরিপাক ও শোষণে বাধার সৃষ্টি করে ডায়রিয়া ঘটায়।

এভাবে দীর্ঘমেয়াদি সংক্রমণের ফলে শিশুর খাদ্যে অরুচি হয় এবং সে ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে। এতে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়।

চিকিৎসা: Albendayole বা Mebendayole অথবা Pyrental pamoate দিয়ে সাধারণত শিশুর কৃমির চিকিৎসা করা হয়। আমাদের দেশে বছরে দু’বার জাতীয় টিকা দিবস পোলিও টিকার পাশাপাশি এক বছর থেকে পাঁচ বছরের শিশুদের কৃমিনাশক ওষুধ (Albendyaole) খাওয়ানো হয়।

প্রতিরোধ

* গৃহস্থালির কাজে নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করতে হবে।

* স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

* খাবারের আগে বা টয়লেটের পরে নিয়মিত হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

* শিশুদের হাতের নখ বড় রাখা যাবে না এবং দাঁত দিয়ে নখ কাটার অভ্যাস পরিহার করতে হবে।

* সময়মতো কৃমিনাশক ওষুধ গ্রহণ করতে হবে।

* মানুষের অপরিশোধিত মল জমির সার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

বর্ষায় খুশকির বিড়ম্বনা

বর্ষাকালে ত্বকের মতোই ক্ষতিগ্রস্ত হয় চুল। বৃষ্টির দিনগুলোতে আর্দ্র আবহাওয়ার কারণে চুলের সমস্যা বেড়ে যায়। তার মধ্যে আবার আছে গরমের দাপট। ঘামের কারণে ত্বক থেকে চুল সব কিছুতেই সমস্যা দেখা দিতে পারে। মাথার স্ক্যাল্পও খুব ঘামতে থাকে এই সময়। এ ছাড়া ভালোভাবে চুল পরিষ্কার না করা, ভুল ডায়েট—এ সব কারণে খুশকির মতো উপসর্গ জাঁকিয়ে বসতে পারে মাথায়।

জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে প্রতিদিনই বাড়ি থেকে বের হতে হচ্ছে। আর তাতেই চুলে জমতে থাকে ধুলা। এতে খুশকি হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

একবার ভেবে দেখুন, আপনার সাজানো গুছানো সেট করা চুলের ফাঁকে ফাঁকে যদি ছোট্ট ছোট্ট সাদা খুশকি ভেসে ওঠে তাহলে কেমন খারাপ লাগতে পারে। বর্ষায় শ্যাম্পু অদলবদল করেও খুশকি থেকে মুক্তি পাচ্ছেন না অনেকেই। তাহলে জেনে নিন এ বর্ষাতে খুশকির দাওয়াই কী হতে পারে।

বৃষ্টির দিনগুলোতে আর্দ্র আবহাওয়ার কারণে চুলের সমস্যা বেড়ে যায় বর্ষার ভেজা ভেজা আবহাওয়াতে চুল কমে পাতলা হয়ে যায়। খুশকি, স্ক্যাল্পে বড় মাপের ফ্লেক্স জমা হওয়ার মতো সমস্যার মুখোমুখি হোন প্রায় সবাই। বেকিং সোডা এবং অ্যাপেল সিডার ভিনিগার ব্যবহার করলে বর্ষায় দিনগুলোতে খুশকি থেকে মুক্তি পেতে পারেন।

যেভাবে তৈরি করবেন: প্রথমে একটি পাত্রের মধ্যে অ্যাপেল সিডার ভিনিগার ও পানি নিয়ে মিশিয়ে নিন। তারপর এতে বেকিং সোডা মিশিয়ে একটি হেয়ার প্যাক তৈরি করুন। একবার চুলে শ্যাম্পু করার পর এই হেয়ার প্যাকটি চুলে ও স্ক্যাল্পে লাগিয়ে ম্যাসাজ করুন। দশ মিনিট স্ক্যাল্পে রাখার পর হালকা গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। এভাবে কয়েকদিন ব্যবহার করলে বর্ষায় খুশকি থেকে মুক্তি মিলবে সহজেই।

ফুসফুসে ক্যানসারের যত লক্ষণ

শুরুর দিকে ফুসফুসের ক্যানসার হয়েছে কিনা বুঝা খুব মুশকিল। এই মরণব্যাধির ঝুঁকির মধ্যে তরা বেশি থাকেন, যারা প্রচুর ধুলাবালুর মধ্যে কাজ করেন, চল্লিশোর্ধ্ব ধূমপায়ী বা তামাকসেবীরা। সাধারণত চল্লিশ শতাংশ রোগীর ফুসফুসের ক্যানসার একবোরে শেষ পর্যায়ে গিয়ে ধরা পড়ে। তবে কিছু উপসর্গ আছে যা দেখে বুঝা যেতে পারে মরণব্যাধি ফুসফুসে ক্যানসার হয়েছে কিনা।

ঘন ঘন সর্দি-কাশি: যে কাশি আট সপ্তাহের বেশি স্থায়ী হয়ে যায় এবং ক্রমশ তীব্র আকার ধারণ করে বুকে ব্যথা তৈরি করে, তখন অবশ্যই সতর্ক হওয়া উচিত। আবার যদি কিছু দিন পর পর ঠাণ্ডা লেগে থাকে, তবে বুঝতে হবে শরীরের ভেতরে কোনো সমস্যা হয়েছে। মনে রাখবেন, সাধারণ কাশি সপ্তাহ খানেকের বেশি স্থায়ী হয় না। তাই দীর্ঘদিন যদি কাশি

না কমে, তাহলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

দীর্ঘদিন গলা বসে যাওয়া, গলার স্বর ভারী হয়ে যাওয়ার মতো উপসর্গ দেখা দিলে যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে
হঠাৎ শ্বাসকষ্ট: প্রতিদিনের জীবনযাপনে অল্প পরিশ্রমে যদি শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে যায় তাহলে অবহেলা করা ঠিক হবে না। হঠাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসের ধরনে বদল আসা ফুসফুসের ক্যানসারের অন্যতম লক্ষণ। ফুসফুসে টিউমার তৈরি হলে বায়ু প্রবাহের পথ রুদ্ধ হতে পারে। আবার কখনও কখনও টিউমারের প্রভাবে ফুসফুসে পানি জমে যেতে পারে। অল্প হাঁটাহাঁটি কিংবা সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করলেই যদি দম ফুরিয়ে আসার উপক্রম হয়, তবে তা উপেক্ষা করা ভুল হবে।

ক্লান্তি সবসময়: সর্বক্ষণ ক্লান্ত লাগলে উদ্বেগ, অবসাদের মতো সমস্যা হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তবে এই সব উপসর্গ ক্যানসারের লক্ষণও হতে পারে। ফুসফুস ঠিক ভাবে কাজ না করলে শরীরে অক্সিজেনের অভাব হয়। তা থেকেই ক্লান্তি আসতে পারে।

কণ্ঠস্বর পরিবর্তন: হঠাৎ করে গলার আওয়াজ কি অন্য রকম লাগছে, তাহলে সাবধান হোন। সর্দি-কাশি হলে এমনটা হওয়া স্বাভাবিক। তবে দীর্ঘদিন গলা বসে যাওয়া, গলার স্বর ভারী হয়ে যাওয়ার মতো উপসর্গ দেখা দিলে যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

দীর্ঘদিন যদি ঘাড়, পিঠ, বুক, বাহুতে ব্যথা হতে থাকে তাহলে সর্তক হোন
বুকে কফ জমা: বুকে কফ জমলে যদি তা আর না যেতে চায়, তবেও ফুসফুসের হাল নিয়ে কিছুটা সতর্ক হওয়া দরকার। কফের সঙ্গে রক্তক্ষরণ হওয়া ভালো লক্ষণ নয়। এর সঙ্গে হাসতে গেলে বা কাশির সময় যদি বুকে ব্যথা অনুভূত হয়, তাহলে সময় নষ্ট না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

মুখের অংশ ফোলে যাওয়া: মুখের এক দিকটা ফোলা দেখালে কিছুটি ভাবনা তো হতেই পারে। ঠাণ্ডা লাগলে কিংবা দাঁতে ব্যথা হলে এমনটা হতে পারে। কিন্তু এই ফোলা ভাব দীর্ঘদিন থাকলে অবশ্যই সতর্ক হবেন, এটি কিন্তু ক্যানসারের লক্ষণ হতে পারে।

ব্যথা ও জ্বর: দীর্ঘদিন যদি ঘাড়, পিঠ, বুক, বাহুতে ব্যথা হতে থাকে তাহলে সর্তক হোন। শতকরা ৫০ ভাগ রোগীর ফুসফুস ক্যানসার ধরা পড়ে বুক ও কাঁধের ব্যথা নিয়ে। সাধারণত কাশির সময় এই ব্যথা বেড়ে যায়। মাঝে মাঝে কারও কারও জ্বর হতে পারে।